২০২

ভোরের কাগজ

তারিখ 25 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

শিক্ষাই গারোদের বেঁচে থাকার অবলম্বন

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ কি করে? রুখে দাঁড়ায়। গারোদের অবস্থা হয়েছে তাই। তবে তাদের রুখে দাঁড়ানোটা অন্যরকম। সংগ্রামের পদ্ধতি ভিন্ন। মারামারি বা লাঠালাঠি নয়। শিক্ষাকে তারা বেছে নিয়েছে হাতিয়ার হিসেবে।

গারোরা আজ নানা সঙ্কটে জর্জরিত। গভীর ক্ষতে আহত তাদের সমাজ। সমতলের মানুষদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। জমি বেহাত। চাষবাস অসম্ভব। কোনোরকমে টিকে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। অন্যকোনো উপায় নেই! লেখাপড়াকে তাই তারা টিকে থাকার অবলম্বন করে নিয়েছে। গারো নেতারা সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'লেখাপড়া কর। নয়তো টিকে থাকতে পারবে না।' গারোদের মধ্যে লেখাপড়ার হার এখন অনেক উঁচু। উপজাতিদের মধ্যে বোধ হয় সর্বোচ্চ। এই হার এমনকি জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

দুর্গাপুর থানার বিরিশিরিতে আছে একটি ব্যাপটিস্ট মিশন। গারোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত। মিশনের সেক্রেটারির মাস্টার বিনোদ কুমার বললেন, 'শতকরা ৮৫ ভাগ গারো বর্তমানে শিক্ষিত। অথচ দেখুন, এদের আর্থিক বুনিয়াদ খুব দুর্বল। তবে শিক্ষার হার যে গতিতে বাড়ছে, তাতে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সকল গারোই শিক্ষার আলো পাবে।'

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গারোদের মধ্যে আগে থেকেই দেখা দিয়েছে। বিনোদ কুমারের মতে, ষাটের দশকের শেষ থেকে তারা ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বাংলাদেশের রয়েছে অনেকগুলো জন জাতি। গারোরা এদের মধ্যে অন্যতম। গারোদের বসবাস দেশের উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়। নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ এ সব জেলায়। গারো পাহাড়ের বাসিন্দা বলে এরা গারো। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংলগ্ন জামালপুর, নেত্রকোনা অঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশি। গারো পাহাড়ের পাদদেশে জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা। গারোদের উৎস আসামে।

মূলত কৃষিজীবী গারো উপজাতির লোকজন। তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে। গত আড়াই দশকে নানা কারণে এই চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। মধ্য ষাট থেকে শুরু হয়েছে সমতলবাসীদের আগ্রাসন। গারোরা জমি হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা আশ্রয় নেয় খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে। অবশ্য এটা তাদের জন্য হয়েছে শাপে বর। শিক্ষার দুয়ার খুলে গেছে তাদের সামনে। আধুনিক জীবনের আলো হাতছানি দেয় গারোদের। গারোরা এখন অধিকাংশই খ্রিস্টান। কিন্তু এতে উপজাতির লোকজন বিমর্ষ হয়নি মোটেও। বরং খুশি।

গারো এলাকায় কাজ করছে ১১টি ব্যাপটিস্ট মিশন। ক্যাথলিক মিশনও আছে ১১টি। গারোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মূল অবদান এ সব মিশনের। ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা মোট ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে।

তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগও দেয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে অনেক ছাত্রছাত্রী। মিশনারিরা এদের জন্য আবাসিক সুবিধা দিচ্ছে। শিক্ষার জন্য কোনো খরচ নেই তাদের। এমনকি মিশন থেকে বৃত্তিও পায় অনেকে। গারো উপজাতির অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। মিশনারিরা এদের জন্য ময়মনসিংহে তিনটি হোস্টেল চালায়। ছেলেদের জন্য দুটি আর মেয়েদের জন্য একটি। গারো মেয়েদের উৎসাহ দেওয়া হয় নার্সিং পেশায়। আর শিক্ষকতায়।

দুর্গাপুরে এক মিশনের শিক্ষা কর্মসূচিতে কাজ করেন দীপক চাম্বুগং। তিনি বলেন, 'গারো বাবা-মা আজকাল অনেক সচেতন হয়েছেন। না খেয়ে থাকেন, তবু ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠান।'

গারোরা আগে কৃষিকাজ ছাড়া কিছু ভাবতো না। আজ তাদের সামনে খুলে গেছে সম্ভাবনার দুয়ার। লেখাপড়া শিখে নানা চাকরি পাচ্ছে। নেত্রকোনায় ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মকর্তারা জানান, গারো জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ আজ চাকরি করছে।

লেখাপড়া শিখে গারোরা আধুনিক হচ্ছেন। ভেঙে পড়ছে তাদের নানা সংস্কার। প্রাচীন মূল্যবোধ যাচ্ছে পাল্টে। তারা দিন দুনিয়ার খবরাখবরও রাখতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

গারোদের সমাজ 'মাতৃতান্ত্রিক'। পৃথিবীতে এ রকম সমাজের সংখ্যা খুব বেশি নেই। গারো মেয়েরা সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি মেয়েতে বর্তায়। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর পরিবারে চলে আসেন।

তবে এই ঐতিহ্য এখন পরিবর্তনের মুখে। পরিবারের সম্পদে এখন ছেলেমেয়ে দুজনের অধিকার থাকছে। সঙ্গী নির্বাচনেও এসেছে পরিবর্তন। গারো তরুণী রায়খান বললেন, 'শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা নিজেদের সঙ্গী নিজেরাই বেছে নিচ্ছে।'

ধর্মের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিপুল। ৯৫ ভাগ গারো আজ খ্রিস্টান। কেবল মাত্র অল্প কিছুসংখ্যক বয়স্ক মানুষ পুরোনো ধর্মবিশ্বাস নিয়ে টিকে আছেন। 'সাংসারেক' এদের ধর্মের নাম। কথা হলো কুলাউড়া ইউনিয়নের চানগাছা গ্রামের সচিন্দ্র রেমার সঙ্গে। তার বয়স ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। রেমা ও তার স্ত্রী এখনো সাংসারেক ধর্মে বিশ্বাসী। পরিবারের অন্যরা খ্রিস্টান। সচিন্দ্র রেমা বললেন, 'গারোদের নিজস্ব বলে আর কিছু নেই। সবাই খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তারা বিয়ে পর্যন্ত করে চার্চে গিয়ে।' বৃদ্ধের বুক থেকে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘশ্বাস।

তবে তরুণ গারোরা উচ্ছ্বসিত। তারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। উপজাতি বলতে পছন্দ করে না।

❑ রুহুল মতিন
নিউজ নেটওয়ার্ক